নারীশিক্ষার চ্যালেঞ্জ

পারভীন হাসান

০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:২৯
আপডেট: ০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:৫২

নানা সমস্যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আক্রান্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সুন্দর ভবন আছে কিন্তু ভালো শিক্ষক নেই । যদি থাকেও, তারা সংখ্যায় নগণ্য। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষার ধরন, কারিকুলাম, যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী ভর্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। তবে কিছু সমস্যা আছে, যা শুধু নারীর ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক।

নারীশিক্ষার পক্ষে বাধা অনেক। মূল বাধা প্রাথমিক পর্যায়েই বলে আমি মনে করি। আমাদের সময়ে স্কুলে আমরা ভালো শিক্ষক পেয়েছি। স্কুলের মাঠে খেলাধুলা করেছি, বাগান করেছি। এসবের মাধ্যমে জীবনের অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু এখন শিক্ষার্থীদের এমন সুযোগ কোথায়! ভালো স্কুল নেই, খেলাধুলার জায়গা নেই, ভালো শিক্ষক নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা নেই। পথে বেরোলে মেয়েদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। আর বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী এবং গ্রামগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পুষ্টিসম্মত খাবার পায় না; পেটে ক্ষুধা নিয়ে স্কুলে গেলে ওই শিশুরা ক্লাসরুমে কী শিখবে। মেধাবী হয়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি তো প্রয়োজন। এর সবই সব শিশু, বিশেষ করে মেয়েশিশুর শিক্ষার পথে বড় বাধা।

ষাটের দশকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, কিংবা এরও আগে যখন স্কুল বা কলেজে পড়তাম, তখন মেয়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একাই যাতায়াত করত। ওই সময়গুলোতে সেই সামাজিক নিরাপত্তাটুকু ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু মেয়েদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সুরক্ষিত ক্যাম্পাস; অথচ আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখি, ছাত্রীরা যখন ক্লাস করছে, তখন অনেকের মায়েরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েদের ক্লাস শেষ হলেই বলতে গেলে ‘ছোঁ’ মেরে নিয়ে যান। মানে হলো, এখন আমাদের সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট নিরাপত্তা নেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েরা তো হবে স্বাধীন! এই স্বাধীনতার জন্যই তো তারা উচ্চশিক্ষা নিতে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় তো কেবল ক্লাস করার জন্য নয়; শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার বাইরেও এখানে মেয়েরা আড্ডা দেবে, ক্লাব করবে, লাইব্রেরিতে সময় কাটাবে। মেয়েদের ব্যাপারে অভিভাবকদের এই যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ, সেটি এখন

মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার যে চিত্র প্রতিদিন খবরে পড়ি, তাতে এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া রয়েছে গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজে যাতায়াতকারী মেয়েদের বখাটে ছেলে কর্তৃক নানা রকম যৌন হয়রানি।

উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, নারীরা অনেকে পেশাজীবীও হচ্ছেন, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। অনেক অভিভাবক এখনো কেবল মেয়ের 'ভালো বিয়ে' দিতে তাকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলা দরকার বলে মনে করেন; এই মানসিকতারও পরিবর্তন দরকার। কেবল বিয়ের কথা না ভেবে মেয়েকে সমাজে স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবে, স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তোলার জন্য উচ্চশিক্ষিত করে তোলার কথা অভিভাবকদের গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের অর্থনৈতিক অর্জন অনেক। তবে এই উন্নয়নের আড়ালে যেসব সমস্যা থেকে যাচ্ছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

গত কয়েক দশকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে, তবে তাদের ঝরে পড়া এখনো ঠেকানো যাচ্ছে না। ভালো স্কুল বা ভালো শিক্ষকের অভাবের কথা বললাম, নিরাপত্তাহীনতার কথা বললাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি, ঢাকার বাইরে একটি কলেজের সঙ্গে পারিবারিকভাবে জড়িত আছি। বহু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও ভালো শিক্ষক পাওয়া যায় না, বিশেষ করে ইংরেজির শিক্ষক কেউ সেখানে থাকতে রাজি নন। বেছে ভালো বেতনে নিয়োগ দেওয়া হলেও কয়েক মাসের মধ্যে তাঁরা চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। একই চিত্র দেশের প্রায় সব অঞ্চলে। ভালো শিক্ষক যদি না থাকেন, তাহলে ভালো শিক্ষার্থী কীভাবে তৈরি হবে। ফলে এই বিষয়টিও নারীর মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের নিশ্চয়তাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিদেশে পড়াশোনার সুবাদে উন্নত দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ হয়েছে আমার। যুক্তরাষ্ট্রে সন্তানকে স্কুল পর্যন্ত পড়ানো বাধ্যতামূলক। সেখানেও নানা মানের স্কুল রয়েছে; স্কুলের মান যা-ই হোক, সন্তানকে সেখানে পাঠাতেই হবে। এখানে ছেলে-মেয়েতে বৈষম্য করা হয় না। সেখানে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের দুপুরে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক শিশুই খালি পেটে স্কুলে যায়। কিছু ক্ষেত্রে খাবার দেওয়ার নিয়ম চালু থাকলেও তা পর্যাপ্ত কি না বা এর মান কী, তার মনিটরিং নেই। মেয়েদের উপবৃত্তির টাকার অঙ্কটাও বাড়ানো দরকার। আমি মনে করি, স্কুলে শিক্ষার্থীর শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করার আগে তাদের খাবার ও পুষ্টি চাহিদার জোগান দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবারের অভাব এবং অপুষ্টি নারীশিক্ষার পক্ষে আরেকটি বড় বাধা। খাবার জোগানের ক্ষেত্রে যাতে ছেলে-মেয়েতে বৈষম্য না করা হয়, সে বিষয়ে পরিবারকে সচেতন হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার বাইরের পঠনপাঠন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে আমাদের আরেকটি বড় তফাত আছে। উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, যাঁরা গবেষণা বা শিক্ষকতার মতো পেশায় আগ্রহী,

কেবল তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার চেষ্টা করেন এবং অন্যরা নিজ আগ্রহ অনুযায়ী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পড়ে পছন্দের পেশায় চলে যান। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চমাধ্যমিকে পাস করা সবাই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথাই ভাবেন। কিন্তু প্রাথমিকে যাদের ভিত সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না, বা পড়াশোনায় যাদের আসলে আগ্রহ নেই, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাদের আবার শুরু থেকে পড়ানো খুব কঠিন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির যে প্রক্রিয়া, তাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বা সামর্থ্যের কথা না ভেবে তাদেরকে শিক্ষক বা অভিভাবকেরা বিষয় নির্ধারণ করে দেন। অনেকে কেবল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্যই যেকোনো একটি বিষয়ে ভর্তির সুযোগ খোঁজে। এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন দরকার। না হলে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা যাবে না এবং এতেও নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ আরও কঠিন হবে।

তাহলে নারীশিক্ষা এমনকি গোটা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আগে প্রাথমিকে ও মাধ্যমিকে মনোযোগ দিতে হবে। ভালো স্কুল, ভালো শিক্ষক, মানসম্মত শিক্ষা যেমন চাই, তেমনি দারিদ্র্য পরিস্থিতিরও পরিবর্তন দরকার। পাশাপাশি সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আবারও বলতে চাই, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা নারীশিক্ষার বড় সমস্যা। তাই আমি মনে করি, আগে এই জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করলেই কেবল শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। উন্নয়নের আড়ালে থেকে যাওয়া ওই সব সমস্যার সঠিক সমাধান না হলে এসব অর্জনের কোনো মূল্যই থাকবে না।

অধ্যাপক পারভীন হাসান উপাচার্য, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি